এই সময়

চাষিরাও এখন জানেন না কত ধানে কত চাল

দু'কথা

ধনী ও গরিব দেশে পরিবেশ সমস্যা আলাদা। গরিব দেশে দূষণ তো আছেই। আর রয়েছে ধনী দেশের ব্যবসায়িক চুক্তির আক্রমণ। **ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ**

করবিস ইমেজেস

পরিবেশ দিবসের ডাক অনেক দিনের। ১৯৭২ সালে আমরা মনে করি যে পরিবেশ আলোচনার ঢাকে কাঠি পড়েছিল। স্টকহোমে। সারা পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষ জড়ো হয়েছিলেন সেখানে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও গিয়েছিলেন। কিন্তু তারও আগে, ১৯৭০ সালে ডাক পড়েছিল বসুন্ধরা দিবস বা আর্থ-ডে'র। আমেরিকায়। ২২ এপ্রিল।

বেশ চলছিল উন্নয়নের জয়যাত্রা। নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে প্রকৃতিকে সীমাহীন সম্পদের উৎস ধরে নিয়ে যথেচ্ছ ময়লা ফেলে, জল, বাতাস আর মাটির গুণাবলী হাজার অত্যাচারেও অপরিবর্তনীয় ধরে নিয়ে। এই উন্নয়নের মান এমন নয় যে সবারই ভালো হচ্ছে। তবে কিছু সংখ্যক মানুষের বা কিছু সংখ্যক দেশের জীবনযাত্রার মান নিঃসন্দেহে মাত্রাছাড়া হয়ে পড়েছে।

কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতির নানান বেয়াড়া জবাবে। জল মাটি আর বাতাসে এমন সব পরিবর্তন হতে শুরু করল যে তা আর মানুষের ব্যবহারের উপযুক্ত থাকছে না। প্রকৃতি আর মানুষের উপর শুরু হল নানা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। আমরাও জানতে শুরু করলাম বিচিত্র, কখনও বা ভয়ানক সেই সব অনুসন্ধানের ফলাফল। প্রকৃতির এই প্রতিবাদী রূপটি সম্পূর্ণ অজানা ছিল তথাকথিত উন্নয়নের পূজারিদের। থমকে দাঁড়াতে হল তাঁদের। মানুষের অপরিণামদর্শী ব্যবহারের ফলে প্রায় সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াগুলি মানুষের প্রয়োজনে প্রায় অকেজো হতে চলেছে বা হয়ে গিয়েছে।

সাধারণ ভাবে এই হল আজকের পরিবেশ সমস্যার গোড়ার কথা। তবে ধনী দেশের মানুষের আর আমাদের মতো দেশের মানুষের পরিবেশ সমস্যা একই ধরনের নয়। তা সে রাষ্ট্রসঙ্ঘের যতই 'আওয়ার কমন' ফিউচার মার্কা প্রচার চলুক না কেন। ধনী দেশ আর গরিব দেশের মানুষের পরিবেশ সমস্যা সম্পূর্ণ দু'ধরনের কার্যকারণ সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। সোজা কথায় আমাদের মতো দেশের মানুষেরা দু'ভাবে আক্রান্ত। প্রথমত নিজের দেশের নানা সমস্যা যেমন জলদূষণ, বায়ুদূষণ, ভূমিক্ষয়, জলাভূমি বুজে যাওয়া— এমন সব কারণের জন্য। অন্য দিকে আছে ধনী দেশের সঙ্গে অবিরত অসম আর একপেশে ব্যবসায়িক (সরাসরি কিংবা পরিবেশের ভেক ধরে) চুক্তির আক্রমণ। এরই জোরে এক দিকে দেশের জীববৈচিত্র, সনাতনী বিদ্যা এবং নানা রসদ, সম্পদ কৌশলে লোপাট হয়ে যাচ্ছে, অন্য দিকে বিষাক্ত জঞ্জাল, অচল প্রযুক্তি আর অর্ধশিক্ষিত 'বিশেষজ্ঞ' পাঠিয়ে সীমাহীন লাভ গুনছে বহুজাতিক এবং তাদের সহযোগী লগ্নিকারী সংস্থাগুলি।

চিন্তার কথা এই যে প্রথম সমস্যাগুলি অর্থাৎ দেশের ভিতরের নানা বিপদ আপদের কথা আলোচনা হলেও দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ ধনী দেশের যে আক্রমণগুলি সর্বস্বান্ত করতে চলেছে আমাদের— এ আলোচনা বেশি হয় না। আলোচনা হয় না, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। আলোচনা করানো হয় না, তাই হয় না। অথচ চোখ খুলে দেখলেই গাদা গাদা প্রমাণ পাওয়া যায়। একটা উদাহরণ দিই।

১৯৯৩ সালের ৫ জুন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আওয়াজ ছিল দারিদ্র আর পরিবেশের অশুভ চক্র ভাঙতে হবে। দারিদ্রের জন্য পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে আবার পরিবেশের ক্ষতিতে দারিদ্র বাড়ছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিলেন তাঁরা। সেই সময়েই, সোমালিয়াতে কোনও খাদ্য ছিল না। দেশ তখন যুদ্ধবাজদের দখলে চলে গিয়েছে আর তারাই আবার দায়িত্ব নিয়েছিল ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের বা লুঠপাটের। এ দিকে গ্রামে গ্রামে চাষিরা গাছ কাটছিলেন জ্বালানির জন্য আর খাচ্ছিলেন ক্ষেতের বীজ। ঠিক এই সময়টাই বেছে নিলেন পশ্চিমের ধনী দেশের মালিকরা। চুপচাপ সোমালিয়ার নয়নাভিরাম সমুদ্র উপকূলে বিষাক্ত জঞ্জালের জাহাজ নামাতে লাগাল। নষ্ট হয়ে গেল সমুদ্রের তলার অপূর্ব প্রবাল রাজ্য। 'সোমালিয়া' কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

গরিব মানুষের পরিবেশ শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে গোড়ার পথটা কিছুটা পরিষ্কার করে না নিলে পরে রাস্তা হারিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যেত। সেই কারণেই এই প্রস্তাবনা। বিশেষত পরিস্থিতিটা এমন নয় যে এর একটা বাঁধা ছক বেরিয়ে এসেছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর। আসলে উল্টোটাই সত্যি। ঢাকে কাঠি পড়েনি। যেটুকু হয়েছে তা প্রচলিত শিক্ষার মধ্যে দিয়েই হয়েছে। যেখানে প্রচলিত শিক্ষার কোনও কার্যকরী অস্তিত্ব নেই, সেখানে পরিবেশ শিক্ষার তেমন উদ্যোগ নেই।

গরিব মানুষ শহরেও আছেন, গ্রামেও। দু'ক্ষেত্রেই পরিবেশ শিক্ষা জরুরি। তবু গ্রামে পরিবেশ সমস্যা খুব কম আলোচিত হয়। এই কারণে তাই নিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। গোড়াতে সাধারণ ভাবে গ্রামাঞ্চলে পরিবেশ সমস্যার গোড়ার কথাটুকু সেরে নিলে ভালো হবে।

একটি ঘটনা এখন বহু আলোচিত। 'সবুজ বিপ্লব'। গ্রামের মানুষের পরিবেশ চেতনা আর প্রাকৃতিক ভারসাম্যের আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যেত যদি আমরা সবুজ বিপ্লবের কথা না টানতাম। কয়েক দশক আগে কী ছিল? ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বনির্ভর একটি কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যেখানে বীজ, সার ও কীটনাশকের জন্য গ্রামের চাষিকে পরমুখাপেক্ষী বা শহরমুখী হতে হত না। বাড়তি উৎপাদনের সম্ভাবনায় লক্ষ লক্ষ চাষি আজ সম্পূর্ণ পরনির্ভর হয়ে পড়েছেন। জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উৎপাদন কমতে শুরু করেছে। আজকের যে কৃষিকাজে সবুজ বিপ্লব চাষিরা সম্পন্ন করেছেন তা তাঁদের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু বছরের প্রচলিত ভারসাম্যকে নষ্ট করে প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একটি নতুন ধরনের আদানপ্রদানের জায়গায় চাষিদের ঠেলে দেওয়া হল, যার কিনা অধিকাংশ শর্তই চাষিদের জানা নেই। চাষিরা আর আজ জোর গলায় বলতে পারেন না কত ধানে কত চাল হবে। উৎপাদন বেড়েছে ঠিকই এবং তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। কিন্তু জল, মাটি আর শস্যের যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে তার জন্য কোনও মতেই চাষিরা দায়ী নন। যেহেতু ওই দুরবস্থা নতুন কৃষিবিজ্ঞানের ফসল, অতএব এ থেকে নিস্তারের রাস্তাও বিজ্ঞানকেই বলে দিতে হবে। তাই পরিবেশ বিজ্ঞানীদের একটি প্রধান দায়িত্ব হবে সবুজ বিপ্লবের আঘাতে গ্রামীণ নড়বড়ে পরিবেশে ভারসাম্যের মেরামতি করা। এই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে না পারলে গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্যে অপরিসীম ক্ষতির জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

> বাড়তি উৎপাদনের সম্ভাবনায় লক্ষ লক্ষ চাষি আজ সম্পূর্ণ পরনির্ভর হয়ে পড়েছেন। জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। উৎপাদন কমতে শুরু করেছে। আজকের যে কৃষিকার্যে সবুজ বিপ্লব চাষিরা সম্পন্ন করেছেন তা তাঁদের উপর বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কী ভাবে হবে তবে গরিব মানুষের পরিবেশ শিক্ষা, যদি গ্রামের কাজটাই প্রথমে শুরু করি? এই ধরনের শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যসূচি কতিপয় বিশেষজ্ঞের চক-ডাস্টার সহযোগে বেঞ্চিতে বসা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকা কিছু মানুষ— এমন ভাবে হবে না। প্রশ্ন হল— কেন এই পরিবেশ শিক্ষা, কী প্রয়োজন পরিবেশ চেতনার। গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে পরিবেশ সংরক্ষণে পঞ্চায়েতের ভূমিকা। সংবিধানের ৭৩ নম্বর সংশোধনী গ্রামের মানুষকে কতটুকু দায়িত্ব দিয়েছে তাদের নিজেদের পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার— এ সবই হল প্রথম দিনের ক্লাসের বিষয়বস্তু। উপস্থিত থাকবেন গ্রামের মানুষ, যাঁদের শিক্ষাগত কিছু যোগ্যতা আছে তাঁরাও থাকবেন কারণ তাঁরা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবেন এ ধরনের পাঠক্রম কার্যকরী করায়। উপস্থিত থাকবেন পঞ্চায়েতের প্রধান এবং অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কারণ তাঁদেরও গুরুদায়িত্ব নির্দিষ্ট করা হয়েছে সংবিধানের সংশোধনীতে। সর্বোপরি উপস্থিত থাকবেন গ্রামের মেয়েরা। আগামী দিনের পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। অন্য দিক দিয়ে বলতে গেলে— যে অঞ্চলে নারীদের ভূমিকা যথেষ্ট নয় সে অঞ্চল পশ্চাৎপদ বলে চিহ্নিত করায় কোনও দ্বিধা থাকবে না।

প্রস্তাবনার পরের ক্লাস হবে সম্পদ পরিচিতির উপর। সারা গ্রাম চষে বেড়াতে হবে দু-তিন দিন ধরে। গ্রামের মানুষ তাদের সম্পদ রসদ ভালোই চেনেন। তাই চেনা জায়গায় বিচরণ করতে তাঁদের কোনও অসুবিধা হবে না। বস্তুত অনেক ক্ষেত্রে তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে যাবেন সম্পদ চিহ্নিতকরণের কাজে। আর এই ফাঁকে তাদের শিখিয়ে দিতে হবে পরিবেশ বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ, প্রত্যেকটি রসদের বা সম্পদের প্রসঙ্গ টেনে টেনে। মাটির তলার জলের কথা দিয়ে শুরু করে সেই জল বেশি তুলতে হলে যে জল ফুরিয়ে যায়, এমনকী আর্সেনিক পর্যন্ত জলে উঠতে আরম্ভ করে— অবলীলায় এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সমস্যা ও তার সমাধানের পথ গ্রামের মানুষের মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে, একান্ত পরিচিত পরিস্থিতিতে আলোচনা করা যাবে। পরিশেষে গ্রামের মানুষকে দিয়ে সম্পদের মানচিত্র আঁকিয়ে নিতে হবে। এই মানচিত্র একান্ত তাঁদেরই বানানো। সবটুকুই তাঁদের জানা থাকবে। সর্বোপরি তাঁরা অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠবেন তাঁদের সম্পদ সংরক্ষণের প্রশ্নে।

এর পরের ক্লাস পরিবেশের বিপদ আপদ নিয়ে। এক দিন গ্রামের মানুষ অভ্যস্ত হয়ে পড়বেন পরিবেশ নিয়ে আলোচনায়। বুঝতে শিখবেন যে এর অনেকটাই তাঁদের পরিচিত এবং যা তাঁদের জানা নেই তা জানার কী প্রয়োজন। পরিবেশের বিপদ আপদের মধ্যে পড়বে নানা ধরনের দূষণের আলোচনা। বিশেষত জলদূষণের আলোচনা। শৌচাগারের প্রয়োজনীয়তা। বোঝাতে হবে যে দূষণমুক্ত পানীয় জল এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা গ্রামকে কত দূর রোগমুক্ত করতে পারে। গ্রামের মেয়েদের বোঝাতে হবে যে বিয়ের সময় শর্ত হিসেবে তাঁরা যেন শ্বশুরমশায়ের কাছে একটি শৌচাগারের দাবি করেন। কেমন করে শ্বশুরমশায় ভাবী পুত্রবধূর আব্রু রাখার কথা ফেলে দেবেন? এটা ঠিকই যে যাঁরা খুব গরিব তাঁরা পারবেন না। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে অনেকেই হয়তো পারেন। কিন্তু করেন না। এই ক্লাস শেষ হওয়ার আগে গ্রামের মানুষ গুরুত্ব অনুযায়ী সাজিয়ে নেবেন তাঁদের পরিবেশে কী কী বিপদ আছে।

বন্যার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে যে আলোচনা হয়, তা হল বন্যায় কত ক্ষয়ক্ষতি হল তা দিয়ে। ভুল-ঠিক যাই হোক একটা হিসেব দিতেই হয়। তেমনই একটা-দু'টো ক্লাস নিতে হবে পরিবেশে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তার হিসেব করার। সব ক্ষয়-ক্ষতিরই টাকায় হিসেব হয় তা নয়, কিন্তু অধিকাংশেরই হয় এবং টাকায় না হলেও গুণগত কোনও মাপ নিশ্চয়ই বার করা যাবে যে কোনও ক্ষয়-ক্ষতির।

এই কাজের সঙ্গে সঙ্গেই শিখিয়ে নিতে হবে পরিবেশের বিপদ এবং ক্ষয়-ক্ষতির উপর নজর কী ভাবে রাখতে হবে। মাটির তলার জল কত নীচে নেমে গেল। খাবার জল দূষিত কি না, গাছপালা, পশুপাখি কমছে কি না, কোনও দুষ্প্রাপ্য গাছ লোপাট হয়ে যাচ্ছে কি না রাতের আঁধারে, মাটি নষ্ট হল কি না, জলাভূমি দখল হয়ে গেল কি না, গ্রামের রোগ ভোগ বাড়ল কি না, এমনই সব নির্দিষ্ট প্রতীকগুলিকে নজরদারির আওতায় আনতে হবে।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। আমাদের মতো দেশে উন্নয়নের কর্মসূচি স্থগিত রাখা যাবে না। যা প্রয়োজন, তা হল এই উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে পরিবেশ সংরক্ষণের শর্তগুলি আরোপ করা। এর জন্য উন্নয়নের গতিপথে কিছু পরিবর্তন হতেই পারে। তবে কখনওই স্তব্ধ করা যাবে না। এই পরিবেশ সংরক্ষণের শর্তগুলি পূরণ করতে অত্যন্ত জরুরি হল সাধারণ মানুষের পরিবেশ চেতনা এবং শিক্ষা। এর মধ্যে যারা প্রচলিত শিক্ষার সুবিধা পান তাঁদের ক্ষেত্রে তো পরিবেশশিক্ষার কাজটি তুলনামূলক ভাবে সোজা। কিন্তু একই ভাবে বা হয়তো বেশি জরুরি হল যে বিশাল সংখ্যার মানুষ প্রচলিত শিক্ষার তেমন কোনও সুযোগ পান না, তাঁদের পরিবেশ শিক্ষা ও চেতনার প্রশ্ন।

কাজটি সোজা নয়। গরিব মানুষের জন্য, বিশেষত যারা প্রচলিত শিক্ষার আওতায় তেমন পড়েন না, তাঁদের জন্য পরিবেশ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে পরিবেশ তৎপরতার মূলস্রোতে থেকে তেমন কিছু করা যাবে না। শুরু করতে হবে প্রায় শূন্য থেকে। একটু ভয়ও করে তাই। করা যাবে তো নাকি 'উদাসীনতার' ওই জবরদস্ত রক্ষাকবচ পরে ঝামেলা এড়িয়ে যাব আমরা, আমাদের এই ইঁদুর দৌড়ের সামনে? ■